রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা।

০৩ চৈত্র ১৪৩০
১৭ মার্চ ২০২৪

বাণী

১৭ মার্চ বাঙালি জাতির ইতিহাসে একটি অবিস্মরণীয় দিন। ১৯২০ সালের এই দিনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের মহান স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গোপালগঞ্জের নিভৃতপল্লি টুঙ্গিপাড়ায় জন্মগ্রহণ করেন। বঙ্গবন্ধু আমাদের মাঝে এসেছিলেন বলেই আমরা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেছি এবং স্বাধীনতা অর্জন করেছি। আর এজন্যই আজ আমরা স্বাধীন দেশের নাগরিক। জাতির পিতার ১০৪তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমি মহান এ নেতার স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

গ্রামের কাদা-জল, মেঠো পথ আর প্রকৃতির খোলামেলা পরিবেশে বেড়ে ওঠা বঙ্গবন্ধু শৈশব থেকেই ছিলেন অত্যন্ত মানবদরদি কিন্তু অধিকার আদায়ে আপসহীন। পরোপকার আর অন্যের দুঃখ-কষ্ট লাঘবে তিনি ছিলেন সদা তৎপর। জীবনের প্রতিটি ক্ষণে যেখানেই অন্যায়-অবিচার, শোষণ-নির্যাতন দেখেছেন, সেখানেই প্রতিবাদ করেছেন। মাত্র ১৪ বছর বয়সে ব্রিটিশ বিরোধী সভা-সমাবেশে অংশ নেন তিনি। এছাড়া গরীব ছাত্র- ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাতে 'মুসলিম সেবা সমিতি' পরিচালনা করেন। চল্লিশের দশকে এই তরুণ ছাত্রনেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সংস্পর্শে এসে সক্রিয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হন।

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের কিছুদিন পরই তরুণ নেতা শেখ মুজিব বুঝতে পেরেছিলেন, ব্রিটিশ পরাধীনতার কবল থেকে মুক্তি পেলেও বাঙালি নতুন করে পশ্চিমাদের শোষণের কবলে পড়েছে। শাসকগোষ্ঠী প্রথম আঘাত হানে বাঙালির মায়ের ভাষা 'বাংলা'র ওপর। বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট পালনকালে ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বঙ্গবন্ধু সচিবালয় গেট থেকে গ্রেফতার হন। এভাবে আন্দোলন-সংগ্রাম ও কারাভোগের মধ্য দিয়েই তিনি বাঙালির অধিকার আদায়ের পথে এগিয়ে চলেন। ১৯৪৮ সালে 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ', '৫২ এর ভাষা আন্দোলন', '৫৪ এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন', '৫৮ এর সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন', '৬৬ এর ৬-দফা', '৬৯ এর গণঅভ্যুত্থান', '৭০ এর নির্বাচন'সহ বাঙালির মুক্তি ও অধিকার আদায়ে পরিচালিত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও স্বাধিকার আন্দোলনে তিনি নেতৃত্ব দেন। এজন্য তাঁকে বহুবার কারাবরণ করতে হয়েছে। সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন। কিন্তু বাঙালির অধিকারের প্রশ্নে তিনি কখনো শাসকগোষ্ঠীর সাথে আপস করেননি।

বঙ্গবন্ধু ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ রেসকোর্স ময়দানে বাঙালির আবেগ ও আকাঙ্ক্ষাকে ধারণ করে বজ্রকণ্ঠে ঘোষণা করেন, "এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম", যা ছিল মূলত স্বাধীনতার ডাক। একটি ভাষণ কীভাবে গোটা জাতিকে জাগিয়ে তোলে, স্বাধীনতার জন্য মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়তে উৎসাহিত করে, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ তার অনন্য উদাহরণ। এ ভাষণে বঙ্গবন্ধু শুধু স্বাধীনতার ডাকই দেননি বরং মুক্তিযুদ্ধের রূপরেখা ও ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কেও দিকনির্দেশনা দিয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী অতর্কিতে নিরস্ত্র বাঙালির উপর আক্রমণ চালালে ২৬ মার্চ প্রথম প্রহরে জাতির পিতা ঘোষণা করেন বাঙালি জাতির বহুকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দীর্ঘ ন'মাস সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে আমরা অর্জন করি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ। মুক্তিযুদ্ধকালীন পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি অবস্থায় শাসকগোষ্ঠী তাঁকে প্রহসনমূলক বিচারের মাধ্যমে ফাঁসির হুকুম দিয়েছিল। অকুতোভয় বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "ফাঁসির মঞ্চে যাওয়ার সময় আমি বলব, আমি বাঙালি, বাংলা আমার দেশ, বাংলা আমার ভাষা"। দেশ ও জনগণের প্রতি তাঁর অসামান্য অবদানের জন্য বাংলা, বাংলাদেশ ও বঙ্গবন্ধু আজ এক ও অভিন্ন সত্তায় পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতার পর পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে জাতির পিতা ১০ জানুয়ারি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্গঠনে তিনি সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। দেশকে 'সোনার বাংলা' হিসেবে গড়ে তোলার সকল প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। কিন্তু স্বাধীনতাবিরোধী ঘাতকচক্র ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট তাঁকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর সেই স্বপ্ন পূরণ হতে দেয়নি। কিন্তু হায়েনার দল বুঝতে পারেনি জীবিত বঙ্গবন্ধুর চেয়ে লোকান্তরের বঙ্গবন্ধু অনেক বেশি শক্তিশালী।

জলে-স্থলে-আকাশে বাংলাদেশের অবস্থান সুদৃঢ় করতে চেয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। বঙ্গবন্ধু আমাদের শিখিয়েছেন কীভাবে শত বাধা বিপত্তি পেরিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছা যায়। ঐতিহাসিক ৭ই মার্চের ভাষণে তিনি বলেছিলেন, "৭ কোটি মানুষকে দাবায়ে রাখতে পারবা না"। বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে যে দেশ স্বাধীন হয়েছিল, অনেক চড়াই-উতরাই পার হয়ে সেই বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ। সকল আশঙ্কা ও নেতিবাচক ধ্যান- ধারণাকে ভুল প্রমাণ করে জাতির পিতার অসমাপ্ত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করে চলেছেন তাঁর সুযোগ্য উত্তরসূরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তাঁর বলিষ্ঠ ও দূরদর্শী নেতৃত্বে আজ আমরা দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছি একটি উন্নত ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার অভিমুখে।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতির চিরন্তন প্রেরণার উৎস। রাজনীতিতে তিনি ছিলেন নীতি ও আদর্শের প্রতীক। বাংলাদেশকে জানতে হলে বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে জানতে হবে, বঙ্গবন্ধুকে জানতে হবে। মুক্তিযুদ্ধের চেতনা আর জাতির পিতার আদর্শকে ধারণ করে জাতি এগিয়ে যাক ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার পথে, নোঙ্গর ফেলুক বঙ্গবন্ধুর 'সোনার বাংলায়'।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মো. সাহাবুদ্দিন

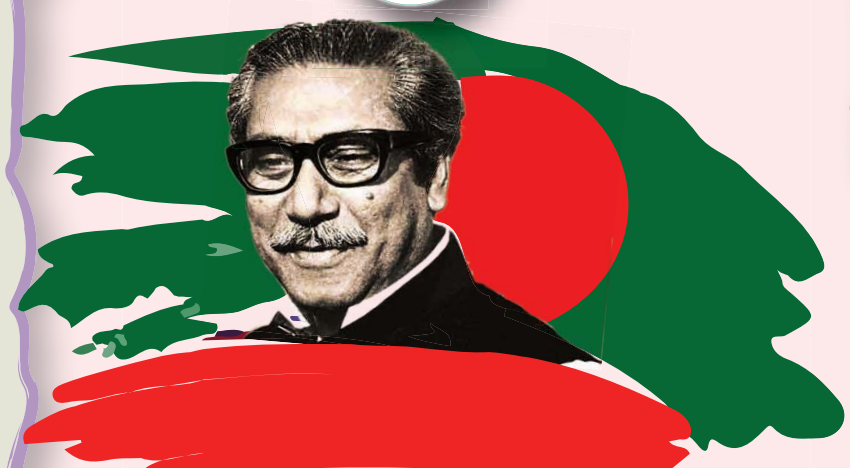

১৭ই মার্চ
জাতীয় শিশু দিবস
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনে
শ্রদ্ধাঞ্জলি

এ এক অভূতপূর্ব দিন

আনোয়ারা সৈয়দ হক

এ এক অভূতপূর্ব দিন।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন।

এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনেই আমাদের দেশে 'জাতীয় শিশু দিবস।'

যে মানুষটি জীবনের সোনালি সময়গুলি জেলখানায় বসে কাটিয়ে গিয়েছেন, যিনি তার কোনো সন্তানের জন্মের সময়ই বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন না বা থাকতে পারেন নি বা জেলখানায় আবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন এবং জন্মের পর তাদের চোখে দেখতে না পাওয়ার জন্য মনের ভেতরে হাহাকার লুকিয়ে রেখেছিলেন, যা কখনো তিনি প্রকাশ করেন নি;

আবার যিনি তাঁর ছোটো ছোটো সন্তানদের বড়ো হয়ে ওঠা চোখে দেখেন নি বা দেখতে পারেন নি, যিনি তাঁর সন্তানদের দৈনন্দিন বড়ো হয়ে ওঠার কোনো সুখ -স্মৃতি মনের কোটরে জমা রাখতে পারেননি, তাদের সেভাবে চোখের সামনে বড়ো হয়ে উঠতে দেখেননি বলে; যিনি তাঁর ছোট্ট মেয়ে রেহানাকে জেলখানায় লাজুক মুখে দূরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মনে মনে ভেবেছেন, আমি জানি আমার এই মেয়েটি আমার কাছে আসতে চায়, আদর চায়, কিন্তু লজ্জায় কাছে আসতে পারছে না;

আবার শিশু রাসেল যখন বাবাকে কাছে পাওয়ার জন্য আকুল হয়ে কেঁদেছে, জেলখানায় একবার তাঁকে দেখতে গেলে সে কিছুতেই বাবার কোল থেকে নামতে চাইত না, আব্বা , আব্বা বলে কাঁদত, বঙ্গমাতা রাসেলকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য যখন নিজকেই আব্বা বলে ডাকতে রাসেল কে ভুলিয়েছিলেন, আর ছোট্ট অবোধ রাসেল জেলখানায় এসে তার বাবার সামনেই তার মাকে যখন আব্বা, আব্বা বলে ডাকত, তখন তাঁর বুক ভেঙে যেত নিজের ঔরসের সন্তানের মুখে বাবা বেঁচে থাকতেও মা কে বাবা বলে সম্বোধন করবার জন্য, তখন পিতা হয়ে অপরাধবোধে ভরে যেত তাঁর বুক, সন্তানকে বাধ্য হয়ে নিজের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চনা করবার জন্য;

আবার যখন তিনি জেলখানার বাহিরে তখনও দেশের মানুষের জন্য সারাটা দেশ ঝটিকা সফর করে বেড়িয়েছেন, বাড়িতে ফিরে যাওয়ার সময় করে উঠতে পারেননি, যিনি তাঁর পুরো দেশটিকেই নিজের পরিবারের মতই নিকট দৃষ্টিতে দেখতেন, দেশের প্রতিটি বিপর্যয়ের সময় যে মানুষটি জনগণের দ্বারপ্রান্তে, সেই মানুষটির মনের ভেতরে তাঁর নিজের ছোটো ছোটো সন্তানদের জন্য একটি হাহাকার কল্পনা করা যায় সর্বদাই বিরাজমান ছিল।

জনগণের জন্য জীবন উৎসর্গ করা মানুষটি তাঁর এই কষ্টের কথা কখনোই মুখ ফুটে কাউকে বলেন নি, রাতের বেলা অন্ধকার কুঠুরিতে বসে নিজের মনের কষ্টের কথা শুধু ডায়েরির পাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন।

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৩ চৈত্র ১৪৩০
১৭ মার্চ ২০২৪

বাণী

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে তাঁর স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি এবং দেশের সকল শিশুসহ দেশবাসীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। জাতীয় শিশু দিবসে এ বছরের প্রতিপাদ্য- 'বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ধরে, আনব হাসি সবার ঘরে' সময়োপযোগী হয়েছে বলে আমি মনে করি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২০ সালের ১৭ মার্চ গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া গ্রামে ঐতিহ্যবাহী শেখ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি ছিলেন নির্ভীক, দয়ালু এবং পরোপকারী। স্কুলে পড়ার সময়েই তাঁর নেতৃত্বের গুণাবলি বিকাশ লাভ করতে থাকে। প্রখর স্মৃতিশক্তির অধিকারী ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন এই বিশ্ববরেণ্য নেতার সুদীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের মূল লক্ষ্য ছিল বাঙালি জাতিকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে ওঠেন বাংলার নিপীড়িত মানুষের অধিকার আদায়ের শেষ আশ্রয়স্থল। সর্বকালের শ্রেষ্ঠ এই বাঙালি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্ব দেন। ১৯৪৮ সালে তাঁর প্রস্তাবে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিশ ও অন্যান্য ছাত্র সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত হয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ। ১৯৪৮ সালের ১১ মার্চ বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতির দাবিতে সাধারণ ধর্মঘট পালনকালে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়। কখনও জেলে থেকে কখনও বা জেলের বাইরে থেকে তিনি ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির ছাত্র-জনতার চূড়ান্ত আন্দোলনে কারান্তরীণ অবস্থায় থেকে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন। এরই ধারাবাহিকতায় '৫৪-র যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন, '৫৮-র আইয়ুব খানের সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন, '৬২-র শিক্ষা কমিশন বিরোধী আন্দোলন, '৬৬-র ছয় দফা, '৬৮-এর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭০-এর নির্বাচন এবং '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের অবিসংবাদিত নেতৃত্বে পরিচালিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের শিশুদের প্রতি অপরিসীম মমতা ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন আজকের শিশুরাই আগামী দিনের ভবিষ্যৎ; শিশুরাই তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তুলবে। শিশুদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে হবে সবার আগে- এই ভাবনা থেকেই জাতিসংঘ শিশুসনদের ১৫ বছর আগে ১৯৭৪ সালে তিনি শিশু আইন প্রণয়ন করেন। শিশু শিক্ষার বিকাশ নিশ্চিত করতে প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেন।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ১৯৯৬ সালে সরকার গঠন করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিনকে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে ১৭ মার্চ 'জাতীয় শিশু দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে এবং শিশুদের কল্যাণে নানামুখি পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ২০০৯ সাল থেকে ধারাবাহিকভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে আমরা 'জাতীয় শিশুনীতি-২০১১', 'শিশু আইন ২০১৩', 'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন- ২০১৭' প্রণয়ন করেছি। এছাড়া সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের পুনর্বাসন এবং বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের বিকাশে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। শিক্ষার্থীদের বছরের শুরুতে বিনামূল্যে নতুন বই প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু আজ স্কুলে যাচ্ছে। আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরেছি। এছাড়াও শিশুদের আগামী দিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য তথ্যপ্রযুক্তিজ্ঞানে সমৃদ্ধ করে গড়ে তোলার উপযোগী সবরকম উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

জাতীয় শিশু দিবসে জাতির পিতার প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মহান নেতার জীবন ও আদর্শ অনুসরণে এ দেশের শিশুদের যথাযোগ্য সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সরকার কাজ করে যাচ্ছে। আজকের শিশুরাই হবে ২০৪১ সালর স্মার্ট বাংলাদেশের স্মার্ট জনগোষ্ঠী। ভবিষ্যত বাংলাদেশকে নেতৃত্ব দেবে আজকের শিশুরাই। আসুন, দলমতনির্বিশেষে সকলে মিলে একযোগে কাজ করে শিশুদের মনে দেশপ্রেম জাগ্রত করে তাদের ব্যক্তিত্ব গঠন, সৃজনশীলতার বিকাশ, আত্মবিশ্বাসী এবং মানবিক গুণাবলি সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলি ।

আমি 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ১০৪তম জন্মবার্ষিকী' এবং 'জাতীয় শিশু দিবস-২০২৪' উপলক্ষ্যে আয়োজিত সকল কর্মসূচির সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র দর্শন

অধ্যাপক ড. মীজানুর রহমান

সৃষ্টিকর্তা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। মানুষের সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র , মানুষ দুনিয়াতে যা কিছু সৃষ্টি করেছে সবচেয়ে বড়ো সৃষ্টি হচ্ছে রাষ্ট্র। রাষ্ট্র যদি না থাকতো আমাদের যা কিছু অর্জন-বিজ্ঞান, সমাজ, ধর্ম, উদ্ভাবন, সবই ভূলুণ্ঠিত হতো। রাষ্ট্র কাঠামো আছে বলেই সবগুলো রক্ষিত হচ্ছে । যেটা আজকের বাংলাদেশ, এই ভূখণ্ডে বিভিন্ন রকমের রাজা ছিল, সামন্তবাদী জমিদার ছিল, ভূঁইয়ারা ছিল, এমন বহু কিছু ছিল, কিন্তু এই অঞ্চল কখনো একটা আধুনিক রাষ্ট্র হবে সেটা কখনো কেউ চিন্তা করেনি। একটি স্বাধীন সার্বভৌম আধুনিক রাষ্ট্র তৈরি করে দিয়ে গেছেন আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। এটা তিনি কীভাবে করলেন সেটা শুধু তাঁর রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে আলোচনা করলেই অনুধাবন করা যায়। ব্রিটিশরা যখন ঔপনিবেশিক শাসন ছেড়ে চলে যাবে বা যেতে বাধ্য হচ্ছে তখনি আমাদের পূর্ব পুরুষরা এই ভূখণ্ডে বসবাসকারীদের একেবারে দুটো জাতিতে বিভক্ত করে। একটা হিন্দু, আরেকটা মুসলমান। এর সুযোগ নিয়ে ব্রিটিশরা তাদের চক্রান্ত অনুযায়ী পাকিস্তান এবং ভারত দুটো রাষ্ট্র তৈরি করে। আমাদের এলাকার লোকেরা অর্থাৎ এই পূর্ব-বাংলার লোকেরা পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্য ভোট দিয়েছিল। হিন্দুদের একটা রাষ্ট্র, মুসলমানদের আরেকটা রাষ্ট্র। যদিও এর মধ্যে কারসাজি ছিল। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মনে কখনই এরকম একটা সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র ভাবনা স্থান পায়নি, এটা তার মাথায় ছিল না। শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত বাঙালি জাতীয় চেতনা ভিত্তিক বাংলাদেশই তাঁর কল্পনার রাষ্ট্র ছিল। তবে সে সময়ের বাস্তবতায় সাম্প্রদায়িক চেতনার বিপরীতে হঠাৎ করে একটা রেডিকেল কিছু করা বাস্তব সম্মত নয় বলেও মনে করতেন। যার কারণে আজকের যে আওয়ামী লীগ, মুক্তিযুদ্ধে নেতৃত্বকারী দল, সেটা কিন্তু

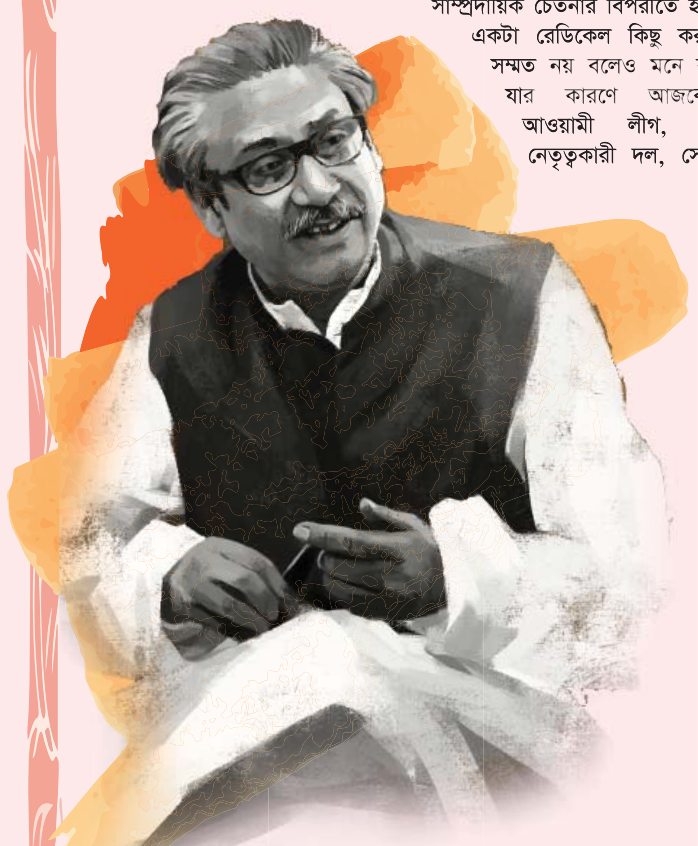

প্রথমে আওয়ামী লীগ ছিল না আওয়ামী মুসলীমলীগ ছিল। ১৯৫৫ সালে বঙ্গবন্ধু অনেকটা একক কর্তৃত্ব ও সাংগঠনিক ক্ষমতায় আওয়ামী মুসলীমলীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দেন। শুরুতেই যদি এই আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম বাদ দেয়া হতো তাহলে দলটি এভাবে এ পর্যায়ে আসতেই পারতো না। কারণ মানুষের মন মানসিকতা তখনও ঐভাবে তৈরি হয়নি। একটা সাম্প্রদায়িক ভাব মানুষের মনে যে কোনো কারণেই হোক ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের শেষের দিকে এসে জোরালো হয়। তারপরেও পাকিস্তান আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং পাকিস্তান তৈরি হলো। প্রথম আঘাতটাই আসে আমাদের ভাষার উপরে।

ছয়দফা আন্দোলনের প্রথম দফাটি ছিল ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ব বাংলার স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে। ১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে বলা হয়েছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলে মুসলমানদের জন্য দুটি আলাদা রাষ্ট্র করা হবে। আর এটাকে কেটে একটা রাষ্ট্র করা হলো। প্রত্যেকটা স্টেটকে স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে, সেটা ছিল ৬ দফা। ভারত ৬ দফা প্রণয়ন করে দিয়েছে এটা বলার বহু লোক এদেশে ছিল। আর এই কারণে খোদ বাঙালির জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান (১৯৬৬) ছয় দফার পক্ষে '*আমাদের বাঁচার দাবি*' পুস্তিকায় জনগণের উদ্দেশ্যে বলেন –

"অতীতে পূর্ব পাকিস্তানবাসীর নিতান্ত সহজ ও ন্যায্য দাবি যখন উঠিয়াছে তখনই এই দালালরা এমনিভাবে হৈচৈ করিয়া উঠিয়াছে। আমাদের মাতৃভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মুক্তির সনদ একুশ দফা দাবি, যুক্ত নির্বাচন প্রথার দাবি, ছাত্র তরুণদের সহজ ও স্বল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভের মাধ্যম করার দাবি ইত্যাদি সকল প্রকার দাবির মধ্যেই এই শোষকের দল ও তাদের দালালরা ইসলাম ও পাকিস্তান ধ্বংসের ষড়যন্ত্র আবিষ্কার করেছেন। আমার প্রস্তাবিত ছয়দফা দাবিকেও তেমনিভাবে পাকিস্তানকে দুই টুকরা করবার দূরভিসন্ধি আরোপ করতেছেন।"

জামায়াত ইসলামী শেখ মুজিবকে ভারতের 'এজেন্ট' আখ্যা দিয়ে ছয় দফা ভারতের প্রণীত বলে দাবি করে। বামপন্থী বিভিন্ন দল এমনকি ন্যাপ (ভাসানী) ছয় দফার সমালোচনা করেছে। ছয় দফার বিরুদ্ধে ন্যাপ-ভাসানী সবচেয়ে বেশি সোচ্চার ছিলো। বাঙালিকে হতবাক করে দিয়ে মাওলানা ভাসানীও ছয় দফাকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। বস্তুত ৬ দফার মধ্যে সরাসরি স্বাধীনতার কোনো কথাও ছিল না, স্বায়ত্তশাসনের কথা ছিল। ১৯৭০ এর নির্বাচনে পূর্ব-পাকিস্তানে ১৬৯ টি আসনের মধ্যে ১৬৭টি আসন আওয়ামী লীগ পেয়ে যায়। তবে ভোটের হিসাবটা ভিন্ন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ভোট পেয়েছিল ৭২. ৫৭ শতাংশ। নির্বাচনি এই ফলাফলের আরেক অর্থ হলো- ৬ দফার বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল ২৭.৪৩% বাঙালি। তার অর্থ দাঁড়াচ্ছে এই দেশের এক চতুর্থাংশেরও বেশি লোক স্বাধীনতা তো দূরের কথা, ৬ দফারও বিরুদ্ধে ছিল। অতএব আমরা সমগ্র জাতি মিলে যুদ্ধ করেছি এটা সঠিক বলি না। এই ২৭.৪৩% শতাংশ লোক মুক্তিযুদ্ধের সময় যাদেরকে আমরা বলি আলবদর, রাজাকার, যুদ্ধাপরাধী, আমাদের মুক্তিযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং হত্যা, রাহাজানি, লুণ্ঠন, অগ্নি সংযোগ এসমস্ত কাজে তারা অংশগ্রহণ করে; পাকিস্তানি

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

মার্চের কাছে বাঙালির যত ঋণ

নাসির আহমেদ

মার্চে প্রথম শুনেছে বাঙালি মুক্তির জয়গান
সাতই মার্চের বজ্রকণ্ঠে উদাত্ত আহ্বান
প্রথম জাগালো ঘুমন্ত এই জাতিকে একাত্তরে
বঙ্গবন্ধু মুক্তির দূত! তোমারই মুখটি আজও জাগে অন্তরে।

হাজার বছর পরাধীন জাতি সেই তো প্রথম জানে
পরাধীনতার শৃংখলছেঁড়া মহা মুক্তির মানে!
দুঃশাসনের, নির্যাতনের নির্মম অপমানে
জ্বলে উঠেছিল এই দেশ পিতা তোমারই তো আহ্বানে।

অসহযোগের সেই মার্চ আজও জেগে আছে চেতনায়
হে মহামানব! সেই গৌরব চির বহমান ইতিহাস লিখে যায়।
চির অম্লান, চির অক্ষয় সাতই মার্চের বজ্রকণ্ঠ-বাণী
কী করে ভুলবো মুছে দিয়েছিল পরাধীনতার গ্লানি!

যারা ভুলে যায় তারা কি বাঙালি? তারা চির দুশমন
বঙ্গবন্ধু তুমি তো অমর, তুমি বাঙালির আজও মহা জাগরণ।
লক্ষ তারায় আকাশটা ভরা, সূর্য তো একটাই
সূর্যের মত প্রোজ্জ্বল তুমি, তোমার তুলনা নাই।

বাঙালির প্রতি নিঃশ্বাসে তাই তোমারই প্রতিধ্বনি
আকাশে-বাতাসে সেই সে কণ্ঠ আজও ওঠে পিতা রণি।
পরাধীন এই জাতির কি হতো স্বাধীনতা কোনোদিন?
সে জাতিকে তুমি মুক্ত করেছো,দিয়েছো রক্তঋণ।

সব অর্জনে উৎস তুমিই, তুমি যে মহান 'মার্চের সন্তান'
কোনোদিন শোধ হবে না সে ঋণ, তোমার যে অবদান।
পঁচিশ এবং ছাব্বিশে মার্চ চির স্মরণীয় আনন্দ- বেদনায়।
তারও তো উৎস চির উজ্জ্বল সতেরোই মার্চ, জন্মের মহিমায়!

তোমার জন্ম মানেই তো পিতা দেশের জন্মদিন
তুমি এসেছিলে বলেই তো এলো স্বাধীনতা একদিন।
জেনে রেখো পিতা তোমাকে এ দেশ ভুলবে না কোনোদিন
রক্ত দিয়েই শোধ করি যেন তোমার রক্তঋণ।

তোমার স্বপ্ন সোনার বাংলা বাস্তব আজ, বিশ্বের বিস্ময়!
তোমারই যোগ্য সাহসী কন্যা ফিরালেন ফের
জয় বাংলার জয়।

এ এক অভূতপূর্ব দিন

জেলখানা থেকে বেরিয়ে আসবার পর ছোট্ট কামাল যখন তাঁকে পিতা বলে চিনতে পারেন নি, এবং তিনি সেটা বুঝতে পেরে ব্যথিত চিত্তে যখন কামালকে কোলে তুলে নিয়ে বলেছিলেন, 'আমি তোমারও আব্বা', তখন পুত্রসন্তানকে একথা বলবার সময় তাঁর বুক যে কতখানি ব্যথিত হয়ে উঠেছিল, সেটা হৃদয় দিয়ে বুঝে উঠলে আমাদের চোখ আবেগে বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে ওঠে।

রাজনীতিবিদদের জীবন যে আর দশটা মানুষের মতো নয়, সেটা তাঁর মতো করে আর কে বুঝেছিলেন?

ফলে তিনি যখন একদিন অজস্র সংগ্রাম শেষে এই দেশটির কর্ণধার হলেন , সামান্য ক'টি বছরই মাত্র তিনি কর্ণধার হতে পেরেছিলেন, তখন যুদ্ধবিদ্ধস্ত একটি দেশ গড়ে তোলার কঠিন দায়িত্ব ও কর্তব্যের ভেতরেও তিনি শিশুদের কথা ভোলেন নি, কারণ শিশুদের ভোলা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না, কারণ তিনি নিজেই ছিলেন এর ভুক্তভোগী।

তিনি প্রয়াত হওয়ার একবছর আগেই প্রণয়ন করেছিলেন শিশু আইন। এই আইনে শিশুদের জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর দূরদৃষ্টি এতই প্রখর ছিল যে তারই ধারাবাহিকতায় কিছু বছর পরে জাতিসংঘ প্রণয়ন করে শিশু সনদ।

এর আগে জাতিসংঘে শিশু সনদ বলে কিছু ছিল না।

বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকাকালীনই শিশুর জন্মের পর তার প্রাথমিক শিক্ষাকে জাতীয়করণ করেছিলেন।

প্রাথমিক শিক্ষা একটি শিশুর জন্য যে সবচেয়ে মূল্যবান শিক্ষা, এটা তিনি বিশ্বাস করতেন। এজন্য এ শিক্ষাকে তিনি বাধ্যতামূলক করেছিলেন।

বঙ্গবন্ধু সর্বদাই ছিলেন জাতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। একটি শিশুর মনোজগতকে গড়ে তুলে তার ভেতরে সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগ্রত করতে চেষ্টা করাই ছিল তাঁর মনোবাসনা। এই চেতনা যে একটি মানুষকে প্রজ্ঞাবান করে তোলে, অন্যায় করতে বাধা দেয়, অনৈতিক কর্মকাণ্ডকে পাশ কাটিয়ে চলে, এটি তিনি জানতেন ও বিশ্বাস করতেন। এবং সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন।

জীবদ্দশায় পিতা হিসেবে তিনি তাঁর শিশুদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন নি, এজন্য নিশ্চয় তাঁর মনে দুঃখবোধ ছিল। তাই হয়ত পরবর্তীকালে যখন তাঁর আজীবনের সংগ্রাম কিছুদূর সফল করতে পেরেছিলেন, সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রামের মধ্য দিয়ে হাজার বছরের পরাধীন বাঙালিকে শৃঙ্খলমুক্ত করতে পেরেছিলেন, তখন তাঁর নিজের জন্মদিনটি ছোটো ছোটো শিশুদের সঙ্গেই কাটাতে ভালোবাসতেন।

তাদের সঙ্গে হেসে খেলে কিছুটা সময় কাটিয়ে দিতেন। গণভবনের পুকুরটির ধারে বসে তিনি তাদের সঙ্গে গল্প কথকতায় সময় কাটাতেন।

হয়ত তখন স্বাভাবিকভাবেই তাঁর মনের মধ্যে নিজের শিশুকালের স্মৃতির জাগরণ ঘটত। তাঁর ছেলেমানুষী নানা প্রকারের দুষ্টুমির কথা মনে হতো। বড়ো মানুষদের রাতের বেলা গাছের নিচে গায়ে সাদা চাদর জড়িয়ে ভূতের ভয় দেখানো, কোনো মানুষ গরিব ছাত্রদের জন্য এক মুঠো চাল দান না করলে গভীর রাতে তাদের ঘরের টিনের চালে দমাদম ঢিল ফেলে তাদের মনে অশরীরি ভীতির সঞ্চার করা, হয়ত তিনি তখন ছেলেবেলার এইসব ঘটনা ভেবে মনে মনে হাসতেন।

কিন্তু তাঁর সকল প্রকার দুষ্টুমির ভেতরেই ছিল একটি ক্রিয়েটিভ চিন্তা। ছেলেবেলায় গরিব ও শিশু ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়ার খরচ চালাবার জন্য একজন শিক্ষকের সহায়তায় তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'মুসলিম সেবা সমিতি।' সুতরাং নিজের শৈশব থেকেই শিশুদের গড়ে ওঠার ব্যাপারে তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল সক্রিয়।

স্কুলের লেখাপড়ার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টিতেও তাঁর উদ্যম ছিল লক্ষ্য করবার মতো।

সাহসিকতা ছিল তার ছেলেবেলার চারিত্রিক বৈশিষ্ট।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু তঁর জীবিতাবস্থায় ১৯৭৪ সালে ২২ শে জুন শিশু আইন জারি করেন। এ আইনটি শিশু অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে ধরা হয়।

শিশুর জন্মের পর তার কিছু প্রাথমিক দায়িত্বও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রের কাঁধে অর্পন করেছিলেন। যুগান্তকরী এই চিন্তা সদ্য জন্ম নেওয়া একটি দেশের জন্য ভয়ানক একটি ঝুঁকির বিষয় ছিল। কারণ দেশের কাঠামো একটা ভাংচুর অবস্থায় ছিল। দীর্ঘ নয় মাস পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর অত্যাচারে দেশটি ছিল ছিন্নভিন্ন । কিন্তু তিনি ছিলেন অতিশয় সাহসী একজন মানুষ। শত বাধা বিপত্তি সত্বেও যে কাজটি আগে করতে হবে, সে কাজ তিনি আগেই করে ফেলেছিলেন।

তিনি ঘোষণা দিলেন যে শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব হবে সরকারের। এবং এই উপলক্ষ্যে তিনি ১৯৭৩ সালে প্রায় সাঁইত্রিশ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয়কে রাষ্ট্রের দায়িত্বে অর্পন করলেন।

নানা সমস্যা জর্জরিত সদ্য জন্ম নেওয়া একটি রাষ্ট্রের পক্ষে সেটি ছিল একটি ভীষন সাহসী পদক্ষেপ। কিন্তু এই যুগান্তকরী সিদ্ধান্তই প্রমাণ করতে পেরেছে যে শিশুকে রাষ্ট্রের একজন সাবলীল নাগরিক হয়ে গড়ে তোলার প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁর এই দিব্য দৃষ্টি। একটি জাতির মেরুদণ্ড যে সেই জাতির শিশু- জনগণ এই দর্শনে বঙ্গবন্ধু ছিলেন বিশ্বাসী।

তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন যে আজ যে শিশু, কালই হয়ত হবে সে দেশের কর্ণধার। তাই শিশুদের ভবিষ্যৎ যেন নিশ্চিৎ এবং সুদৃঢ় হতে পারে, সেই লক্ষ্যে তিনি কাজ করে গিয়েছিলেন।

শিশুদের প্রতি জাতির পিতার এহেন দৃষ্টিভঙ্গিই পরবর্তীকালে আওয়ামী লীগ সরকারকে ১৭ মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করতে উদ্বুদ্ধ করে।

বাংলাদেশে ছিন্নমূল শিশুরাও যেন তাদের নাগরিক অধিকার পায় তার জন্যও এই জাতীয় শিশু দিবস, ক্রমে

শিশু অধিকার দিবস হিসেবে দেশ ও জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে।

কিন্তু দুঃখের সঙ্গে আমাদের এখন স্বীকার করতে হবে যে বর্তমানে পৃথিবীর বাস্তবতা ভিন্ন পথে প্রবাহিত হচ্ছে। আজ এ পৃথিবী শিশুদের জন্য একটি অনিরাপদ স্থান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গাজায় আজ লক্ষ লক্ষ শিশু অনিরাপত্তায় ভুগছে। ইসরাইলের অনৈতিক যুদ্ধের কারণে এবং অমানবিকভাবে আক্রমণে আজ ফিলিস্তিনের গাজায় হাজার হাজার শিশু তাদের প্রাণ হারিয়েছে, এখনও হারাচ্ছে। খাদ্যের অভাবে তারা অপুষ্টিতে ভুগছে। নানা প্রকারের অসুখে ভুগছে। শিশুদেরও যে বড়োদের মত বেঁচে থাকার অধিকার আছে এই কথাটা যুদ্ধ লোভী মানুষেরা আজ মানতে নারাজ। অনেক বাবা মা নিজেদের প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে শিশু সন্তানদের ফেলে রেখে চলে যাচ্ছে। এক শ্বাপদ সঙ্কুল পরিবেশে পৃথিবীর শিশুরা বর্তমানে অসহায় জীবনযাপন করছে। এবং বিশাল পরাক্রমী এক ধ্বংসকামী শক্তির কাছে পৃথিবী যেন আজ জিম্মি হয়ে পড়েছে।

এই পৃথিবী মানুষের কাম্য নয়। কোনোদিনও ছিল না।

সেই হিসেবে আমাদের বর্তমান বাংলাদেশের অবস্থা ভিন্ন বলতে হবে। কারণ আমাদের বর্তমান সরকার শিশুদের সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। শিশুদের সার্বিক কল্যাণে দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রণয়ন করেছেন জাতীয় শিশুনীতি। দেশের প্রচলিত শিশু আইনকে বর্তমান যুগের উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছেন। যার নাম শিশু আইন ২০১৩। মেয়েদের বাল্যবিবাহ রোধ করার জন্যও প্রণয়ণ করেছেন আইন।

একটা সুন্দর ও সুষম সমাজ গড়ে তুলতে হলে শিশুরাই হচ্ছে দেশের মানুষের মূল সম্পদ। তাদের গড়ে ওঠার ওপরেই সমগ্র জাতি নির্ভর করে থাকে। দেশের বর্তমান সরকার মনে করেন জনগণের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে একটি শিশুর সুন্দর ভাবে গড়ে ওঠার ওপর। একমাত্র শিশুরাই পারবে বড়ো হয়ে ২০৪১ সালের ভেতরে একটি স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে। সেই লক্ষ্য সামনে রেখেই বর্তমান সরকার কাজ করে যাচ্ছেন। শুধু লেখাপড়া নয়, তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের জন্য কাজ করে যাচ্ছেন। সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই সরকার বছরের প্রথম দিনেই শিশুদের হাতে তুলে দিচ্ছেন নতুন বই, প্রদান করছেন উপবৃত্তি। শিশুরা যেন নির্বিঘ্নে তাদের লেখাপড়া করতে পারে এই প্রচেষ্টা সরকারের। আমাদের দেশে সাধারণ মানুষেরা তাদের মেয়ে শিশুদের শিক্ষা অসমাপ্ত রেখে অপরিণত বয়সেই তাদের বিয়ে দিয়ে দেন। সেজন্য সরকার তৈরি করেছে বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন। আবার যে সকল কর্মী মায়েরা তাদের ছোটো ছোটো শিশু সঙ্গে নিয়ে কল-কারখানা, হাসপাতাল কিংবা গার্মেন্টস-এ কাজ করে যান, তাদের শিশুদের দিনের বেলা দেখাশোনা করবার জন্য তৈরি করেছেন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র, শুরু করেছেন পথশিশু পুনর্বাসন কার্যক্রম ও ডে-কেয়ার সেন্টার। এছাড়াও শিশুদের সঠিক বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন রকমের সাংস্কৃতিক এবং বুদ্ধিবৃত্তি চর্চা কার্যক্রম চালু করেছেন।

শুধু তাই নয়, বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিবস কে শিশুদের জন্য উৎসর্গ করে ১৯৯৬ সাল থেকে ১৭ ই মার্চ জাতীয় শিশু দিবস হিসেবে পালন করে আসছেন।

এই দিবসের মূল দর্শন হচ্ছে শিশুদের প্রিয় মাতৃভূমিকে একটি নিরাপদ আবাসভূমিতে পরিণত করা।

নিজের মাতৃভূমির প্রতি শিশুদের আস্থা গড়ে তোলা। জাতির পিতার মানব কল্যাণের মহৎ আদর্শকে নিজের হৃদয়ে ধারণ করা ও বিশ্বাস করা। এবং পরবর্তী সময়ে সৃজনশীল এবং গঠনশীল কার্যক্রমের মাধ্যমে নিজের মাতৃভূমিকে বিশ্বের সমুখে গৌরবের সঙ্গে তুলে ধরা। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমাদের শিশুরা তাদের জীবনের চলার পথে সঠিক দিকনির্দেশনা পেলে মাতৃভূমির এই আদর্শ ও স্বপ্ন পূরণ করতে সক্ষম হবে।

আমাদের স্মরণে আছে ১৯৭১ সালে, আমাদের দেশ যখন পাকিস্তান হানাদার বাহিনীর দাপটে নিস্পেষিত হচ্ছে, বাংলার মানুষ যখন বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে প্রতিবাদে ক্রমে ফুঁসে উঠছে, তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেন, ''বাংলাদেশের মুক্তির স্পৃহাকে কিছুতেই নিভিয়ে দেওয়া যাবে না। আমাদের ভবিষ্যতের বংশধরেরা যাতে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে সম্মানের সঙ্গে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করতে পারে তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য আমরা সবাই প্রয়োজন হলে জীবন দিতে প্রস্তুত। তাই আমাদেরকে কেউ পদানত করতে পারবে না।''

বঙ্গবন্ধুর সেই ঘোষণাকে, তাঁর সেই মহান স্বপ্নকে বাংলার জনগণ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে এবং বাংলার কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র ও খেটে খাওয়া এবং দেশ প্রেমিক ও অনুগত শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী মানুষের সহায়তায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ এই রাষ্ট্রে পরিণত করতে সক্ষম হয়েছে।

ভালো হতো যদি আমরা বঙ্গবন্ধুর পদাঙ্ক অনুসরণ করে সকলেই এই দিনটি আমাদের নিজ নিজ সংসারে বাড়ির শিশুদের সঙ্গে উদযাপন করতে পারি। বর্তমান যুগে আমাদের সাধারণ মানুষের জীবন একটি যান্ত্রিক কলকজায় পরিণত হয়েছে। আমরা শত ইচ্ছা হলেও নিজেদের শিশুদের সঙ্গে সেভাবে সময় কাটাতে পারছি নে। তাদের সঙ্গে হাসি, খেলা, ছোটো ছোটো গল্পকথা বা ছোটো ছোটো উপহার দিয়ে আমরা তাদের মন ভরাতে পারছিনে। দৈনন্দিন জীবনের চাপে আমরা অনেক সময় ইচ্ছা না হলেও তাদের কচি মনে আঘাত দিয়ে বসে থাকি। আমরা নিজেরা এজন্য অপরাধবোধে ভুগি।

তাই বছরের এই একটি দিন যদি আমরা আমাদের পরিবেশের শিশুদের জন্য ব্যয় করি, তাহলে আমরা নিজেদের মনের ভেতরেও অনেক খানি আস্থা খুঁজে পাবো। আমাদের শিশুদের এই উপলব্ধি দিয়ে ভরাতে পারব যে আমরা সর্বক্ষণই তাদের শুভ কামনা মনের মধ্যে ধরে রাখি।

ব্যাপারটা মোটেই কঠিন কিছু নয়, যদি সেভাবে আমরা চিন্তা করতে পারি।

তাছাড়া আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় দেখেছি অধিকাংশ শিশু মনে করে বাবা মায়েরা তাদের সেভাবে ভালোবাসেন না। তারা ভাবে যে তাদের বাবা মায়েরা মনে করেন একমাত্র ক্লাসে ফাস্ট- সেকেন্ড হওয়া ছেলেমেদেরই ভালোবাসতে হবে। এর ফলে তাদের মনের ভেতরে সর্বদাই ক্লাসের পড়ুয়া বন্ধুদের সঙ্গে একধারণের গোপন রেশারেশি চলতে থাকে। অনেকসময় তারা হীনমন্যতায় ভোগে। তার জন্য শিশু বয়স থেকেই তাদের মানসিক বিকাশ ব্যহত হয়। অনেক অবুঝ মাতাকে আমরা বলতে শুনেছি যে তারা শিশুদের একথা বলছেন যে, তুমি যদি এবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হতে পার তাহলে তোমাকে আমি বেশি করে ভালোবাসব। যা কিনতে চাইবে, তাই কিনে দেব।

এরকমের একটি ভ্রান্ত মেসেজ বাবা মায়ের কাছ থেকে আজকাল অনেক শিশুই পেয়ে থাকে। যেটি তাদের শিশু মনকে ভয়াবহভাবে পীড়িত এবং বিকৃত করে তোলে।

অরেকটি ভয়াবহ ব্যাপার এই ঘটছে যে, স্কুলের ছেলেমেয়েদের মায়েদের ভেতরে একধরণের রেষারেষি বা পাওয়ার গেম। অমুকের ছেলে বা মেয়ে পরীক্ষায় তমুকের ছেলে বা মেয়ের চেয়ে বেশি মার্ক পেয়েছে বা বেশি ভালো করেছে, এতে করে অনেক মা মনে করেন তার সন্তানের বিজয়ের ভাগীদার তিনিও। তিনি তখন পরাজিত ছাত্রটির মায়ের ওপরে নিজের স্থানটিকে ধারণ করতে থাকেন।

জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষ্যে এইসব বাবা মায়েদেরও সুযোগ ঘটছে তখন নিজেদের মধ্যে সম্প্রীতি গড়ে তোলা।

ক্লাসের ফার্স্ট বা সেকেন্ড ছাত্রছাত্রী নয়, দেশের সকল ছাত্রছাত্রী, জাত ধর্ম এবং বাবা মায়ের পদবী নির্বিশেষে আমাদের বাংলাদেশের নাগরিক। তারা সকলেই আমাদের আদরের ধন। কারণ তাদের সুন্দরভাবে বেড়ে ওঠার ওপরেই আমাদের দেশ এবং রাষ্ট্রের উন্নতি নির্ভরশীল।

সমাজে আজকাল যেসব শিক্ষিত এবং পদমর্যাদা ধারণকারী মানুষেরা রাষ্ট্র পরিচালনা করতে সরকারকে বা দেশবাসীকে সাহায্য করছেন, তাদের অধিকাংশই উঠে এসেছেন সমাজের গ্রাসরুট পর্যায় থেকে। তাঁরাই আজ আমাদের দেশের সার্বিক উন্নয়নের কর্মকর্তা। এটি কখনোই সম্ভব হতো না যদি না বঙ্গবন্ধু এই রাষ্ট্রটির শুরুতেই এরকম যুগান্তকরী চিন্তা না করতেন।

অনেক ভালো হতো যদি আমরা আমাদের বঙ্গবন্ধুর জন্ম দিনে নিজেদের বা নিজের না হলে পাড়ার শিশুদের নিয়ে একটু হাসি গানে কথকথায় দিনটি কাটাতে পারতাম। তাহলে সেটাই হতো আমাদের বঙ্গবন্ধুর প্রতি জন্মদিনের কিছুটা হলেও শ্রদ্ধা নিবেদন।

আমরা এ পৃথিবীতে মাত্রই অল্প কিছুদিনের জন্য আসি। চোখের নিমিষে আমরা আমাদের অজান্তেই পার হয়ে যাচ্ছি যোজন যোজন পথ। অতিশয় বৃদ্ধ বয়সেও মানুষের মনে হবে এই তো সেদিনই আমার সব ছিল। আর এখন কিছুই নেই! জীবনের চলার পথে তাই কিছুটা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী রেখে পথ চলাটা ভালো।

তাহলে মানুষ অনেক কষ্ট- দুঃখ ও আশাভঙ্গকে সহজভাবে নিতে শিখবে।

তাই জীবনের একটি দিন জাতীয়ভাবে যদি আমাদের শিশুদের জন্য ব্যয় করি তবে সেটা মোটেও কোনো অযৌক্তিক হবে না।

আমাদের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কথা দিয়ে এই নিবন্ধটির সীমারেখা টানতে চাই। আর সেটি হলো এই যে, আমাদের এই মহান স্থপতি, এই মহামানব, দেশের স্বাধীনতার পর মাত্র অল্প কিছুদিনই জীবিত ছিলেন । মাত্র ৫৫ বছর বয়সেই বিশ্বাসঘাতকের গুলিতে তার জীবনাবসান ঘটে। যেমন আড়াইশো বছর আগে ঘটেছিল বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার । বাঙালি জাতিকে গৌরবের শিখরে পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে তাঁর অনেক কিছুই করবার ইচ্ছে ছিল, অনেক স্বপ্ন ছিল, কিন্তু সেগুলি বাস্তবে রূপান্তরিত করে ওঠার সময় পাননি। তবে সেজন্য জাতি এখন পিছিয়ে নেই।

তাঁরই ঔরসে জন্ম নেয়া তাঁরই উত্তরসূরি সুযোগ্য কন্যা বর্তমানে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তিনি পিতার অসাধিত স্বপ্নকে আজ বাস্তবে রূপদান করার জন্য অমানুষিক পরিশ্রম করে চলেছেন। তাঁরই নেতৃত্বে দেশ আজ সদর্পে তার সমৃদ্ধির ডালি নিয়ে সম্মুখের দিকে এগিয়ে চলেছে। বিশেষ করে নারী ক্ষমতায়ন ও শিশুর বিকাশে তাঁর সরকার প্রভূত উন্নতি করেছে।

তাঁর বর্তমান স্বপ্ন ২০৪১ সালের ভেতরেই নিজের মাতৃভূমিকে পৃথিবীর বুকে একটি স্মার্ট দেশ হিসেবে গড়ে তোলা।

আজ বঙ্গবন্ধু যেখানেই থাকুন না কেন, তিনি তাঁর এই সন্তানের হাসিমুখের অবর্ণনীয় পরিশ্রম নিজের চোখেই অবলোকন করছেন এবং প্রতিনিয়তই তাঁর এই সাধনাকে আশীর্বাদ করছেন এই বিশ্বাস আজ দেশবাসীর মনে জাগ্রত হয়েছে।

জয় শিশু দিবস।

জয় শিশু দিবস। বঙ্গবন্ধুর জন্মদিন, শিশুর জন্য শপথ নিন। ❑

লেখক : প্রখ্যাত কথাসাহিত্যিক

বঙ্গবন্ধুর রাষ্ট্র দর্শন

হানাদার বাহিনীকে সহায়তা করে। এরা ছিল আমাদের অভ্যন্তরীণ শত্রু। আন্তর্জাতিকভাবে গুটিকয়েক দেশ ছাড়া সারা পৃথিবী আমাদের বিপক্ষে ছিল। চীন ছিল পাকিস্তানের সবচেয়ে বড়ো বন্ধু। আমেরিকারও একই অবস্থা। সৌদিআরবসহ মুসলিম দেশগুলো প্রায় সবাই এদেশে হত্যা, ধর্ষণ ও লুণ্ঠনকে সমর্থন করেছিল। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর আমাদের দেশ বিজয় লাভ করার মাত্র ৯ দিন আগের ঘটনা, ৭ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের পক্ষে বিপক্ষে ভোটাভুটিতে ১১০টা দেশ আমাদের বিপক্ষে ভোট দিয়েছিল। সৌদি আরব আমাদের স্বীকৃতি দেয় ১৯৭৫ সালের ১৬ আগস্ট সন্ধ্যায়। প্রথমে নিশ্চিত হয় যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু'র দাফন কাফন সম্পন্ন হয়েছে, এর পরেই আমাদের স্বীকৃতি দেয়। বিদেশি শত্রু যারা ছিল তাদের আবার শাখা প্রশাখা ছিল দেশের ভিতরে, যাদেরকে আমরা বলি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী। ১৯৬০ ও ৭০ এর দশকে যাদের সারা পৃথিবীব্যাপী প্রভাব ছিল। এদের বিভিন্ন সংঘবদ্ধ দল যেমন, পূর্ববাংলার কমুনিস্ট পার্টি, সর্বহারা পার্টি, প্রত্যেকটা দল অধিকাংশ ক্ষেত্রে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে ছিল এবং কোথাও কোথাও তারা মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। নোয়াখালীতে মুক্তিযোদ্ধাদের হত্যা করার জন্য এই সংঘবদ্ধ দলগুলো সক্রিয় ছিল। এই যে ত্রিপক্ষীয় শক্তি, দেশের অভ্যন্তরীণ দালাল, বিদেশী শক্তি এবং তাদের দালালরা সবাই আমাদের অগ্রসর চিন্তার বিপক্ষে ছিল। ১৫ আগস্ট ১৯৭৫ একদিকে সেনাবাহিনীর একটা দল চলে গেল শেখ মনির বাড়িতে, এক গ্রুপ চলে গেল আব্দুর রব সেরনিয়াবাদের বাড়িতে, অন্যদল চলে গেল ৩২ নম্বরে, একটা দল চলে এলো রেডিওতে। রেডিওতে যারা এলো তারা এসেই স্বাধীনতার স্লোগান 'জয় বাংলা'-কে নির্বাসিত করে পাকিস্তানী কায়দায় বাংলাদেশ জিন্দাবাদ ঘোষণা করে, বাংলাদেশ বেতার হয়ে গেল 'রেডিও বাংলাদেশ'। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট কেবলমাত্র রাষ্ট্র ক্ষমতা বদল করার একটা অভ্যুত্থান ছিল না। তখন বিভিন্ন দেশে প্রায়ই অভ্যুত্থান হতো, এই অভ্যুত্থানগুলোর কারণ ছিল রাষ্ট্রক্ষমতা বদল করা। সকালে একজন, বিকেল বেলা আরেকজন। তখন কমন একটা ব্যাপার ছিল ক্ষমতা দখল। পুরা বিশ্ব কোল্ড ওয়ারের আওতায় ছিল; রাশিয়ান বলয়, আমেরিকান বলয়; পাল্টা পাল্টি এগুলো ছিল।

বঙ্গবন্ধু আমাদেরকে যে দেশটা স্বাধীন করে দিয়ে গেছেন, ১৯৭৫'র পর সে রাষ্ট্রটি ছিল না। এটা কেবল পুনরুদ্ধার করা হয় ১৯৯৬ সালে, পাকিস্তান থেকে আবার বাংলাদেশ। যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু স্বাধীন রাষ্ট্র চেয়েছিলেন, সেটার পুনঃজন্ম হয়। আমরা এখন একটা উদার গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এখানে যেরকম ধর্ম নিরপেক্ষতার কথা বলা হয় তা হলো সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা। আমরা যে গণতন্ত্রের কথা বলি, সেটা বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্রের কথা। গণতন্ত্রের একটা সংজ্ঞা আছে যেটা আব্রাহাম লিংকন দিয়ে গেছেন। বঙ্গবন্ধুর গণতন্ত্রের সংজ্ঞা যদি নেন তাহলে কিন্তু গণতন্ত্রের ভিতরে যে সমস্যাগুলি রয়েছে

সেগুলো চিহ্নিত করা যাবে। গণতন্ত্রই সর্বোৎকৃষ্ট ব্যবস্থা এটা বলা যাবে না। এর চেয়ে ভালো ব্যবস্থা আর নেই বলেই আমরা বলি এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যবস্থা। গণতন্ত্র বলতেই বুঝানো হয় সবাই যেটা বলবে অথবা মেজোরিটি লোক যেটা বলবে এটাই মেনে নেওয়া। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের ভাষণের মধ্যে বঙ্গবন্ধু বলে গেছেন, একজনও যদি ন্যায্য কথা বলেন সেটা মেনে নেয়াই হচ্ছে গণতন্ত্র। বঙ্গবন্ধুর ভাষায় "...যদি কেউ ন্যায্য কথা বলে, আমরা সংখ্যায় বেশি হলেও একজন যদিও সে হয় তার ন্যায্য কথা আমরা মেনে নেব।" তাহলে গণতন্ত্রের সংজ্ঞাটা কি হওয়া উচিৎ? গণতন্ত্র বলতে বঙ্গবন্ধু কি বুঝালেন? আমরা সনাতনভাবে গণতন্ত্র বলতে যা বুঝি, সবাই মিলে বা বেশিরভাগ লোকে যা ভালো বুঝি, সেটাই গণতন্ত্র। পৃথিবীতে এমন অনেক ঘটনা আছে সবাই মিলে ভুল করছে। অধিকাংশ লোক বা সব লোক যেটা বলছে সেটাই সত্য? মানুষের মধ্যে সবাই মিলে যা বলে এটাকে সত্য হিসেবে ধরে নেওয়ায় একটা প্রবণতা আদিকাল থেকে ছিল। সূর্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘোরে এটি তো কিতাবেও লেখা ছিল। সবাই যেহেতু এটা বলছে আর সবাই যেহেতু এটা লিখছে আর কিতাবে যেহেতু আছে সেটাই সবাই বিশ্বাস করছে। আসল সত্যটা হচ্ছে, সূর্য স্থির আছে, পৃথিবীই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। এটা বলতে গিয়ে অনেকের জীবন চলে গেছে। অতএব গণতন্ত্র বলতে সবাই যেটা বুঝে, এটা গণতন্ত্র না। অথবা বেশির ভাগ মানুষ যা বোঝে সেটা গণতন্ত্র না, যেটা ন্যায্য কথা, যেটি সত্য কথা, সেটাই গণতন্ত্র। সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনী বিল গৃহীত হওয়ার পরদিন বঙ্গবন্ধু জাতীয় সংসদে ভাষণে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন:

"আমি চাই শোষিতের গণতন্ত্র, শোষকের নয়। এখনো মানুষ না খেয়ে কষ্ট পাচ্ছে। যে মানুষের কাপড় নাই, যে মানুষ বন্ধু খুঁজে পায় না, যার বুকের হাড্ডি পর্যন্ত দেখা যায়, আমি জীবনভর এদের সঙ্গে থেকে সংগ্রাম করেছি। এদের পাশাপাশি রয়েছি। কারা নির্যাতন ভোগ করেছি। আমার সহকর্মীরা জীবন দিয়েছে। তাদের দুঃখ দূর করার জন্য আমি একদিন এই হাউজে বলেছি, আমরা শোষিতের গণতন্ত্র চাই [...] যারা রাতের অন্ধকারে পয়সা লুট করে, যারা বড়ো বড়ো অর্থশালী লোক, যারা ভোট কেনার জন্য পয়সা পায় তাদের গণতন্ত্র নয়, শোষিতের গণতন্ত্র। এটা আজকের কথা নয়, বহুদিনের কথা আমাদের।"

আমাদের জাতীয় পরিচয়টা কী হবে, আমরা এটা নিয়েও অনেক সময় বিতর্কে জড়িয়ে পড়ি। আমরা বাঙালি ছিলাম তারপরেও তো আমাদেরকে বাংলাদেশী করে দেওয়া হলো। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে আমাদের যে সংবিধান, জাতির পিতা ১৯৭২ সালে আমাদের উপহার দিয়েছিলেন, সে সংবিধান একটা স্তম্ভ হচ্ছে জাতীয়তাবাদ। বঙ্গবন্ধু ১৯৭২ সালের ১০ই জানুয়ারি রেসকোর্সে যে ভাষণ দিয়েছিলেন "আমি বাঙালি, আমি মানুষ, আমি মুসলমান" এই তিনটি পরিচয় অর্থাৎ বাঙালি, মুসলমান, মানুষ এর সংমিশ্রনটা আমরা পেয়েছি। আমরা যে মুসলমান এটার সাথে মরুভূমির মুসলমানের পার্থক্য আছে। বাঙালির সংস্কৃতি ও মানবিকতা মিশিয়ে আমাদের জাতির পিতা বলেছিলেন বাঙালি জাতীয়তাবাদের কথা। যেটা দিয়ে আমি অন্যদের থেকে আলাদা হবো। কিন্তু ধর্মের মধ্যে যে মরু সংস্কৃতি ছিল সেটা পুরোটাই চলে আসছে। মরুভূমি থেকে ডলার আসছে, ডলারের সাথে সাথে চিন্তার মরুকরণ, ওখানকার কালচার, পোশাক, লেবাস, অবয়বে পরিবর্তন সব কিছুই আসছে। আজ যেটাকে মরু কালচার বলছি ষাট-সত্তরের দশকেও এরকম ছিল না। সত্তরের দশকে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পোশাক-আশাক, চেহারায় এত মেরুকরণ ছিল না। এখন মেরুকরণ ব্যাপকহারে বাড়ছে। বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তার একটি অন্যতম ভিত্তি হলো অসাম্প্রদায়িক চিন্তা। বাংলাদেশ রাষ্ট্রেরও অন্যতম দার্শনিক ভিত্তি এটি। অসাম্প্রদায়িক চিন্তা আর বাঙালি জাতীয়তাবাদ একই সূত্রে গাঁথা। এটি সত্য, বঙ্গবন্ধু তরুণ বয়সে মুসলিম লীগের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। জনসাধারণের দুঃখ লাঘব করতে তখন তিনি দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য লঙ্গরখানা খুলে কাজ করেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশে খাদ্যের অভাব দেখা দিলে, তিনি সুষম খাদ্য বণ্টনের আন্দোলন, ভুখা মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্রতিরোধে কাজ করেন। ১৯৪৬ সালের ১৬ আগস্ট কলকাতায় মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসকে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ে। তরুণ মুজিব ছুটে বেড়ান দাঙ্গাকবলিত মুসলিম, হিন্দু দুই জনগোষ্ঠীকেই উদ্ধার করতে। বঙ্গবন্ধুর ভাষায়: "দু-এক জায়গায় উদ্ধার করতে যেয়ে আক্রান্তও হয়েছিলাম। আমরা হিন্দুদের উদ্ধার করে হিন্দু মহল্লায় পাঠাতে সাহায্য করেছি। মনে হয়েছে, মানুষ তার মানবতা হারিয়ে পশুতে পরিণত হয়েছে।" কলকাতায় তিনি হিন্দু, মুসলমান দুই সম্প্রদায়ের লোককেই উদ্ধারের চেষ্টা করেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনার জন্য মহাত্মা গান্ধীর দ্বারস্থ হয়েছিলেন সোহরাওয়ার্দী। সোহরাওয়ার্দীর সেই প্রচেষ্টায় তখন বঙ্গবন্ধুও যুক্ত হন। পাকিস্তান আন্দোলনে যুক্ত হলেও বঙ্গবন্ধু রাজনৈতিক জীবনের প্রথম থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে সুসংহত করেছিলেন অসাম্প্রদায়িক চেতনা ছড়িয়েই। আবুল মনসুর আহমেদ, আতাউর রহমান খান মুসলিম বাঙালি জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে 'মুসলিম বাংলা' প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। অসংখ্য কমিউনিস্ট নেতাদের আমরা সেই মতাদর্শিক বিষয়ে কলম ধরতে দেখেছি। কিন্তু বঙ্গবন্ধু পূর্ব-বাংলায় হিন্দু-মুসলিম বিভেদে রাজি ছিলেন না। তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম বাঙালির সমর্থন পেতে কখনো হিন্দু বাঙালির বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি ও সংঘাতের রাজনীতি করেননি। বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানি শোষকদের হাত থেকে বাঙালির মুক্তি আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে যুক্ত করেন। বাঙালির ইতিহাসে বঙ্গবন্ধুই প্রথম এবং সম্ভবত একমাত্র সফল নেতা যিনি হিন্দু-মুসলিম দুই সম্প্রদায়কে একত্রিত করেছেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে মুসলিমদের সমর্থন ছিলো না, আবার উচ্চ বর্ণের হিন্দু নেতারাও মুসলিমদের এইসব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যুক্ত হননি। বঙ্গবন্ধু এমনকি বাঙালিদের অন্য কোনো জাতির বিরুদ্ধে, যেমন বিহারিদের বিরুদ্ধে, সহিংস আচরণে প্ররোচণা দেননি। বরং তাদের নিরাপত্তা দিতে ৭ মার্চের ভাষণে আওয়ামী লীগ কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন। "এই বাংলায় হিন্দু-মুসলিম, বাঙালি, অ-বাঙালি যারা আছে তারা আমাদের ভাই, তাদের রক্ষার দায়িত্ব আপনাদের উপর, আমাদের যেন বদনাম না হয়।" তিনি সকল জনগোষ্ঠীর সহাবস্থান এবং সব নাগরিকের সমান অধিকারে বিশ্বাস করতেন।

বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক দর্শনে সাম্যের কথাটা এসেছিল সমাজতন্ত্র হিসেবে। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন পুঁজিবাদী অর্থনীতি দর্শনগতভাবেই মানুষে মানুষে বিভেদ উদ্রেককারী। আর এইজন্য *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে বঙ্গবন্ধু বলছেন:

"আমি নিজে কমিউনিস্ট নই, তবে সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করি এবং পুঁজিবাদী অর্থনীতিতে বিশ্বাস করি না। একে আমি শোষণের যন্ত্র হিসেবে মনে করি। এই পুঁজিপতি সৃষ্টির অর্থনীতি যত দিন দুনিয়ায় থাকবে, তত দিন দুনিয়ার মানুষের উপর থেকে শোষণ বন্ধ হতে পারে না। পুঁজিপতিরা নিজেদের স্বার্থে বিশ্বযুদ্ধ লাগাতে বদ্ধপরিকর। নতুন স্বাধীনতাপ্রাপ্ত জনগণের কর্তব্য বিশ্ব শান্তির জন্য সংঘবদ্ধভাবে চেষ্টা করা। যুগ যুগ ধরে পরাধীনতার শৃঙ্খলে যারা আবদ্ধ ছিল , সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যাদের সর্বস্ব লুট করেছে- তাদের প্রয়োজন নিজের দেশকে গড়া ও জনগণের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক মুক্তির দিকে সর্বশক্তি নিয়োগ করা।"

তখন সমাজতন্ত্র শব্দটার জয়জয়কার। সমাজতন্ত্র একটা রোমান্টিক শব্দ। কেবল মনোজগতে নয়, ব্যক্তি জীবনেও বঙ্গবন্ধু অসাম্য দূর করার, সমাজের সুবিধাবঞ্চিত ব্যক্তির পক্ষে কাজ করেছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ায় ছাত্রত্ব হারিয়েছেন। অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে আমরা দেখি, দাওয়ালদের (যারা ধান মৌসুমে দিনমজুর হিসেবে ধান কাটে) যৌক্তিক দাবি অগ্রাহ্য করে পাকিস্তান সরকার যখন দাওয়ালদের ধান কেড়ে নেয় তখন তরুণ মুজিব প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন।

জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা সেটা ছিল সাম্যের বাংলাদেশ। সমাজতন্ত্রের মাধ্যমে রাষ্ট্রে মেহনতী মানুষের কল্যাণ এবং রাষ্ট্রীয় সম্পদে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব তা বঙ্গবন্ধুর মনে ১৯৫০ ও ৬০ এর দশকে জায়গা করে নেয়। সমাজতন্ত্র বলতে তিনি প্রধানত শোষণমুক্ত এবং বৈষম্যহীন একটা ব্যবস্থার কথা ভাবতেন। ১৯৫২ সালে চীন ভ্রমণের পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে একটি সমতা ভিত্তিক রাষ্ট্রের পার্থক্য তিনি উপলব্ধি করেন। তা *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*তে লিখেছেন: 'তাদের সঙ্গে আমাদের পার্থক্য হলো তাদের জনগণ জানতে পারল ও অনুভব করতে পারল এই দেশ ও এ দেশের সম্পদ তাদের। আর আমাদের জনগণ বুঝতে আরম্ভ করল, জাতীয় সম্পদ বিশেষ গোষ্ঠীর আর তারা যেন কেউই নন (পৃ. ৩৩৪)।' বঙ্গবন্ধু দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন, শোষণমুক্তি এবং বৈষম্য দূরীকরণে সরকারের দায়িত্ব রয়েছে। চীনে গিয়ে তাঁর এই বিশ্বাস আরো দৃঢ় হয়। তিনি দেখতে পান, কীভাবে চীনে সামন্ততান্ত্রিক ভূমি মালিকানা পরিবর্তিত হয়েছে, ভূমিহীন কৃষক জমির মালিক হয়েছে - "আজ চীন দেশ কৃষক-মজুরের দেশ। শোষক শ্রেণি শেষ হয়ে গেছে।" নতুন নতুন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে রাষ্ট্র কীভাবে ছেলেমেয়েদের শিক্ষা প্রাপ্তির মৌলিক চাহিদার ক্ষেত্রে বৈষম্য দূর করেছে (পৃ. ২৩০)। অনেক স্বপ্নই আমরা এখন দেখি, বঙ্গবন্ধু এতো স্বপ্ন দেখেননি। বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন ছিল মিলেমিশে বাংলাদেশ, ধনী-গরিব, পুরুষ-মহিলা, হিন্দু-মুসলমান, বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান সবাই মিলে সাম্যের বাংলাদেশ। সবাই মিলেমিশে থাকবো। বৈষম্যের কারণে অর্থনীতিতে একটা অরাজকতা তৈরি হয় সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। ক্যাসিনোতে যারা নিঃস্ব হয়ে যায় তাদেরকে ক্যাসিনোর মালিকরা খাওয়ার ব্যবস্থা করেন। আমরাও যদি এরকম ধনী হয়ে গেলাম, ধনী হতে গিয়ে সব কিছু কয়েক জনের হাতে চলে গেল, আমরা কেবল খেয়ে বেঁচে থাকলাম। আমার মনে হয় না যে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা এটা ছিল। আর আমরা বলছি যে আয় বাড়ছে, বলছি ডলারের হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশ, উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ ইত্যাদি। ইরাক, সিরিয়া, মিশর, অনেক আগেই ডলারের হিসেবে মধ্যম আয়ের দেশ ছিল। কিন্তু সেই দেশগুলো সেভাবে টিকে নেই। না টেকার কারণ হচ্ছে মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব বা দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব। যে স্বপ্ন নিয়ে জাতির পিতা স্বাধীনতা যুদ্ধে নেতৃত্ব দিয়েছেন, যেই স্বপ্ন নিয়ে আমরা বাংলাদেশ করলাম যেটাকে বলি মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। সেই চেতনা থেকেই যদি দূরে সরে যাই সেটা দিয়ে হয়তো উন্নয়ন হবে, কিন্তু টেকসই হবে না। যেটা ইরাক, সিরিয়া, মিশরের ক্ষেত্রে হয়েছে। অতএব আমি আবারও বলছি জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বলতে কেবল ধনী বাংলাদেশ না। যে দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে জাতির পিতা একটা স্বাধীন সার্বভৌম আলাদা স্বতন্ত্র রাষ্ট্র সৃষ্টি করলেন, সেটা ছিল সাম্যের বাংলাদেশ, অসাম্প্রাদায়িক বাংলাদেশ, মানুষে মানুষে ভালোবাসার বাংলাদেশ। সেখান থেকে কোনোভাবে আমাদের বিচ্ছিন্ন হওয়া যাবে না এবং সেটাই আমাদের অর্জন করতে হবে। দেশের শত্রুরা যারা একেবারে ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকেই সব কিছুর বিরোধিতা করে আসছে, তারা কখনোই নিষ্ক্রিয় হয়না। মাঝে মধ্যে দুর্বল হয়, এখানে সেখানে লুকায়, কিন্তু মনে রাখতে হবে এই অপশক্তি কখনই নিঃশেষ হয় না। নিঃসন্দেহে বাঙালির হাজার বছরের ইতিহাসে মুক্তিযুদ্ধই সর্বশ্রেষ্ঠ ঘটনা। বাঙালি জাতি তার দীর্ঘদিনের চড়াই-উতরাই পেরিয়ে নিজেদের জন্য একটি জাতি রাষ্ট্র গঠন করেছে। কিন্তু বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভিত্তি কী হবে? ১৯৭০ ও ৮০'র দশকে জেনারেলরা ট্যাঙ্কের বলে সংবিধান ইচ্ছা মতো স্থগিত করেছে, সংশোধন করেছে। বাংলাদেশকে বানিয়েছিল পূর্ব পাকিস্তান। বাংলাদেশকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীল মৌলবাদী গোষ্ঠীর কাছে, যারা বাংলাদেশের জন্ম এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা দুটোই অস্বীকার করে। দেশের ও আশেপাশের মৌলবাদী আগ্রাসন রোধে এবং ক্রমবর্ধমান বৈষম্য দূর করে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের রাষ্ট্র গড়তে আমাদেরকে বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক চিন্তাধারার কাছে ফিরতে হবে; বাংলাদেশকে তার দার্শনিক ভিত্তি- বাঙালিত্ব, অসাম্প্রদায়িকতা, সাম্য ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজকে রাষ্ট্রীয় নীতির কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। ❑

লেখক: প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ, সাবেক ভিসি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়